Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.43-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ধন্বন্তরী কালী ও জয়চন্ডী মন্দির: সেকাল ও একাল

পল্লবী সরদার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Dhanantari Kali and Jaychandir Temples are the famous traditional temples of Jayanagar Majilpur area of South 24 Parganas district. The 400-year-old maiden story of this temple is rotated in the people mouth, with the 'Besher mela' on the occasion of the mother's birth in Bengali 'Baishakh' month, it is known that at this time sixteen changes and special witches are conducted. After the end of this fair, the worship of the Jayachandi temple begins in the Bengali 'Joistha' month and here too after worshiping and worshiping the mother for a long time, food (Onnovog) is distributed. Pilgrim visitors from far and wide flock to this fair. The origin, greatness, rules and regulations of this traditional temple is a sign of how much it is accepted or respected by the modern-society, tried to highlight through survey.

Keywords: Dhanantari Kali, Jaychandi, Besher mela, sixteen changes of witches, modern-society, Bali protha, variation culture, rupantar.

প্রথম পরিচ্ছেদ: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা জুড়ে গড়ে উঠেছে বহু কালীক্ষেত্র, প্রত্যেকটি মন্দিরে কিংবদন্তির অন্ত নেই। এক একটি মন্দির এক এক রকম মাহাত্ম্য কেন্দ্রিক কাহিনী বা জনশ্রুতি রয়েছে যা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনই এক কালী মন্দির হলো দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত জয়নগর মজিল্পুর পৌরসভা এলাকার পার্শ্ববর্তী মজিল্পুর গ্রামের রায়পাড়া থানে প্রসিদ্ধ কালীমাতা ধন্বন্তরী কালি রূপে পূজিত হয়ে আসছে শতাব্দী ব্যাপ্তি। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে আদি গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলগুলো ছিল জনশূন্য ও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। ফলত লোকালয় থেকে দূর নিবিড় বনাঞ্চলপূর্ণ স্থানে গড়ে তুলেছিল তাদের শক্তি সাধনার ক্ষেত্র। আরো জানা যায় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে গঙ্গাসাগরগামী আদি গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হত বর্তমান মজিলপুর গ্রামের উপর দিয়ে। জয়নগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত মুজিলপুর গ্রামটি জয়নগর অপেক্ষা বয়সে নবীন। প্রাচীনকালে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, সেই সময় সেখানে ভাগিরথী নদী প্রবাহিত হত। মনে করা হয় আদি গঙ্গা মজে গিয়ে স্থানটি গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বসতি স্থাপনের জন্য জায়গাটি জনবহুল হয়ে ওঠে সেই থেকেই জায়গাটির নামকরণ হয়েছে মজিলপুর। মজিলপুর গ্রামটি পদ্মপুকুর নামেও পরিচিত। জানা যায় বর্তমানে যে স্থানে ধন্বন্তরী কালী মন্দিরটি অবস্থিত, পূর্বে সেই স্থানটি শ্মশান ছিল। ডায়মন্ড হারবারের পার্শ্ববর্তী নেতড়া গ্রাম থেকে আগত জনৈক ভৈরবানন্দ নামে এক তন্ত্রসাধক ভাগিরথীর মাঝে তৈরি হওয়া চড়ার উপর বসে সাধনা করতো, সেটাই ছিল তাঁর সাধনাক্ষেত্র। একদিন তিনি

দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং দেবী জানান যে তিনি পদ্মপুকুর নামক জলাশয়ে পড়ে রয়েছেন, তাকে উদ্ধার করে পুজো করার নির্দেশ দেন। সাধক দৈব আদেশ অনুযায়ী পুকুরের সন্ধান করেন এবং পদ্মপুকুর জলাশয়ের এক কোন থেকে কালো কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি খুঁজে পান। মাতৃ আদেশ অনুযায়ী তিনি খড়ের চালার কুঠিরে মূর্তি পুজো শুরু করেন। কষ্টিপাথরের মূর্তির বয়স প্রায় তিনশ বছর। পরবর্তী সময়ে ভৈরবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, সাধক তাঁর শিষ্যকে ওই মূর্তি পূজার দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র চলে যান সাধনার উদ্দেশ্যে। রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ছিলেন মজিলপুরের ঠাকুরবাড়ির আদিপুরুষ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী আবারো দেবীর স্বপ্নাদেশ পান এবং দেবী জানান যে পদ্ম পুকুরের পাশে পড়ে থাকা নিম কাঠ দিয়ে দেবী বিগ্রহ নির্মাণ করতে আদেশ দেন, কষ্টিপাথরে মায়ের মূর্তির অনুকরনে নিম কাঠের মূর্তিটি তৈরি হয় এবং বর্তমানে সেই মূর্তি পূজিত হয়ে আসছে। রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তীর পুজোয় সন্তুষ্ট হয়ে মা কালী তাকে একটি দৈব ওষুধ প্রদান করেন, যা পান করলে বাতের ব্যাথা সহ নানা জটিল রোগের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। দৈব প্রদিত ওষুধ ধন্বন্তরীর মতো কাজ করতো বলে মায়ের নাম 'ধন্বন্তরী' কালী হয় এবং মন্দিরের নাম হয় 'ধন্বন্তরী কালীবাড়ি' মায়ের গর্ভ মন্দিরে বেদীর উপর রয়েছে একটি কারুকার্য খচিত কাঠের তৈরী রথের সিংহাসন। তাতে পদ্মের উপর শুয়ে আছেন মহাদেব, তাঁরই বক্ষস্থলে দাঁড়িয়ে দেবী কালীকা, মহাদেবের মাথাটি দেবীর বাম দিকে রয়েছে। দেবী মূর্তি নিম কাঠ দিয়ে নির্মিত এবং গাত্রবর্ণ কালো, বসন পরিহিতা-অলংকার সজ্জিতা, এলানো কেশ কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে, তিনি ত্রিনয়নী দক্ষিণ মুখী দক্ষিণা কালী, দুটি কর্ণে কুণ্ডল শোভিত। দেবী মূর্তির চারটি বাহু দ্বারা নির্মিত বামদিকে দুটি বাহুর একটি বাহুতে খড়গো বা খাঁড়া রয়েছে অপরটিতে নর মুণ্ড এবং দক্ষিণের দুই বাহুতে একটিতে বরাভর প্রদান করছেন এবং অন্যটি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রতীক স্বরূপ রয়েছে। মায়ের ডানদিকে সিংহাসনের নীচে একটি বারা মূর্তি রয়েছে। মায়ের পূজার দায়ভার কেবলমাত্র রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী পরিবারের বংশধরদের, তাই চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রধান পৌরাহিত্য পালন করে আসছে।

মা দক্ষিণা কালী রূপে বিরাজমান হওয়া সত্বেও 'ধন্বন্তরী' নামকরণের প্রেক্ষাপটে একটি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে, প্রায় চারশো বছরের পুরনো এই মন্দিরে দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত মহোঔষধ পাওয়া যায়। ভক্তদের ওই ওষুধ সেবনের ফলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা, বাতের ব্যথা ইত্যাদি নানা দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। শারীরিক জটিল রোগ রয়েছে এবং বহুবার চিকিৎসার পরও ফলপ্রদ না হওয়ার দরুন রোগে কাতর ভক্তরা মায়ের থানে মানসিক করে ও মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পুকুরে স্নান করে ঔষধ খায় এবং পূজা দেয়। জানা যায় ওই ওষুধ ধন্বন্তরীর মতো কাজ করে। মধ্যযুগে মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা ধন্বন্তরীর কথা শুনে এসেছি তিনি স্বর্গের বৈদ্যরাজ, মরা মানুষ জীবিত করতে পারতেন। তেমনই ময়ের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত ওষুধ দ্রুত রোগ নিরাময় করে, এজন্য ভক্তরা মায়ের নাম দেন ধন্বন্তরী কালী। এই ঔষধ সেবনের বিশেষ কিছু কৌশল রয়েছে, তা হল ওষুধ খাওয়া চলাকালীন রোগীকে নিরামিষ খেতে হয় তিন দিন বা এক সপ্তাহ, এছাড়াও অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ভাত খাওয়া চলে না ফলমূল, সাবু ইত্যাদি খেয়ে থাকতে হয়, এছাড়া কবজ বা মাদুলি ধারণ করতে হলেও হতে পারে। মূলত এসকল কিছুই নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাসের উপর।

মায়ের মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি শিব মন্দির, তিনি ভৈরব রূপে অবস্থান করছেন। মন্দির সংলগ্ন আরো একটি শিবলিঙ্গ পুজিত হয়। মায়ের মন্দিরের পাশেই রয়েছে বড় ঠাকুর বা শনি দেবতার মন্দির,

প্রতি সপ্তাহে শনিবার মঙ্গলবার মন্দিরে পূর্ণার্থীদের ভিড় বেশি দেখা যায়, এছাড়া অমবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ও বিশেষ পূজা-পাঠ চলে।

ধন্বন্তরী মায়ের প্রধান পূজা হয়ে থাকে বছরে চারবার যথা **ফলহারিনী কালী পূজা (জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্জিকা অনুসারে), রটন্তী কালী পূজা (মাঘ মাসের পঞ্জিকা অনুসারে), মায়ের জন্মতিথিতে (বৈশাখ মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমা শুক্লপক্ষে), কালী পূজা (কার্তিক মাস)**। এই দিনগুলিতে মায়ের বিশেষ পূজা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক পূজাকে কেন্দ্র করে উৎসব মেলার মহল গড়ে ওঠে ও বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা ভিড় জমাতে শুরু করেন।

বৈশাখ মাশে মায়ের জন্মতিথিতে যে পূজা হয় সেটি জয়নগর তথা বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত মেলার একটি '**বেশের মেলা**'। বেশের মেলা চলে একমাস অবধি কিন্তু পূজা হয় ষোল দিন ধরে। একে বেশের মেলা বলার কারণ হলো এই সময় মা ধন্বন্তরী ষোল দিন ধরে অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ষোল রকম বেশ ধারণ করে পূজিত হন। মায়ের ষোল রকম বেশের নাম হল- **১) প্রতিপদ কৌমারী**, **২) দ্বিতীয়া বিপদতারিণী**, **৩) তৃতীয়া ভুবনেশ্বরী**, **৪) চতুর্থী গণেশ জননী**, **৫) পঞ্চমী কৃষ্ণকালী**, **৬) ষষ্ঠী বরাহী**, **৭) সপ্তমী নরসিংহী বেশ**, **৮) অষ্টমী শঙ্কট্য কালী**, **৯) নবমী জগদ্ধাত্রী**, **১০) দশমী জাহ্নবী**, **১১) একাদশী অন্নপূর্ণা**, **১২) দ্বাদশী কালীয় দমন**, **১৩) ত্রয়োদশী ইন্দ্রানী**, **১৪) চতুর্দশী দক্ষিণা কালী**, **১৫) পূর্ণিমা ষড়শী বেশ**, এই ষড়শী বেশ ধারণ করে মা তিনদিন থাকেন, একে **১৬) রাজরাজেশ্বরী** বেশ বলা হয়।

বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথি থেকে শুরু করে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুক্লাপক্ষ পর্যন্ত মায়ের এই ষোলটি রূপ পরিবর্তন হয়। এই সময় মায়ের পূজার বিশেষ রীতিনীতি লক্ষণীয়, অমবস্যা তিথি থেকে পূর্ণিমার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে মায়ের রূপসজ্জার রূপান্তর ও সকালের বিশেষ পূজা সাথে বলি প্রথার নিয়ম চলে আসছে পূর্বপুরুষ পরম্পরা ধরে, অবশ্য এখানে কেবলমাত্র ছাগ বলি দেওয়া হয়। বহু পুণ্যার্থীর 'মানসিক' পূর্ণ হলে মন্দিরর পার্শ্ববর্তী পুকুর থেকে স্নান করে 'গন্ডী' কাটেন, ধুনো পোড়ান এবং নিজ নিজ সাধ্যমতন দক্ষিণাসহ পূজার ডালি সাজিয়ে মায়ের পূজা দিয়ে থাকেন। দুপুরবেলা মধ্যাহ্নভোজে মাকে অন্নভোগ, সাথে পাঁচ রকম ভাজা, নানা তরিতরকারি, মাছ (পোনা, ভেটকি, শোল), বলির মাংস সহযোগে নৈবেদ্য নিবেদন করার রীতি চলে আসছে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যারতি ও বিশেষভাবে হোমযজ্ঞ হয়ে থাকে। এছাড়া পূর্ণিমা শেষের তিনদিন পর আট ভাজা (চাল, চিড়ে, বাদাম, ছোলা, মোটর, পাপড়, আলু, আদা, কাঁচা লঙ্কা, পোস্ত, নারকেল ইত্যাদি) নানা মশলা সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে। মায়ের পূজা ষোল দিন চললেও, এই পূজাকেন্দ্রিক মেলা চলে একমাস ধরে। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থীগণ আসেন মায়ের দর্শনে ও মনস্কামনা পূরণের আশায়।

ধন্বন্তরীর কালীর ডানদিকে একটি কাঠের নির্মিত বারামূর্তির সাদৃশ দক্ষিণরায়ের মূর্তি আছে। এ ধরনের মূর্তি আর কোথাও দেখা যায় না। পুজারী চক্রবর্তী বংশের অন্যতম প্রবীন শ্রী অলোক চক্রবর্তী (৭৫) র মতে এটি আনুমানিক দেড়শ বছরের প্রাচীন বারামূর্তি। মূর্তির কণ্ঠের অংশ লম্বাটে, মস্তিষ্কের মস্তক বন্ধনীর মধ্যে কয়েকটি চিত্রিত কাষ্ঠ নির্মিত পালক শোভা পাচ্ছে, পালকে ত্রিপত্র ও সূর্য চিহ্ন রয়েছে। দক্ষিণরায় স্বরূপ মুখমণ্ডলটি বড় বড় চোখে গুম্ফ সম্মিলিত সহাস্য ও লম্বা কর্ণে কুন্তল বেষ্টিত। ফলত বারামূর্তির মাথায় এই যে পালক বা পাতা সজ্জিত মুকুট, এটি আদিবাসীদের সজ্জার অন্যতম চিহ্ন স্বরূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মজিল্পুরের ধন্বন্তরী কালীর পাশাপাশি আরো একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে বিষয়বস্তুর ছন্দপতন ঘটবে, তা হল জয়চন্ডী তলা। এই জয়চন্ডী তলা সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনী লোক মুখে

আবর্তিত। জয়নগর কুলপি রোড সংলগ্ন এলাকার রথতলার পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত, এবং লোকশ্রুতি অনুযায়ী জানা যায় যে, মা জয়চন্ডীর নাম অনুসারেই 'জয়নগর' নাম হয়েছে। কথিত আছে প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে মতিলাল বংশের আদি পুরুষ গুনানন্দ মতিলালের প্রতিষ্ঠিত জয়চন্ডীর মূর্তি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে এলাকাটি নদীতীরবর্তী জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ শ্মশান ছিল, এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম যোগাযোগ স্থল এই নদী। জনশ্রুতি গুনানন্দ মতিলাল তাঁর আদি নিবাস যশোরের বিক্রম হতে সপরিবারে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করে পুণ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে যাত্রা করেন। পথে বিশ্রামের জন্য জয়নগর পার্শ্ববর্তী রাজার ঘাটে নৌকা দাঁড় করান এবং আশপাশের পরিবেশ দেখার জন্য বাইরে আসেন, ক্ষণিক দূরে লক্ষ্য করেন এক বালিকা হেঁটে যাচ্ছেন কলসি কাঁকে, তার পিছু নিতে অদূরে যেতেই দেখেন সেই বালিকা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। মনে মনে বিষণ্ণতা বোধ করলেও কৌতুহলী মতিলাল মহাশয় নৌকায় এসে বিশ্রাম করার সময় মধ্যরাতে সেই বালিকারূপী দেবী মূর্তির স্বপ্নাদেশ পান। বালিকা নিজের পরিচয় স্বরূপ বলেন যে, তিনি জয়চন্ডী ওই স্থানের অধিষ্টাত্রী দেবী, ঘন জঙ্গলাকীর্ণ বকুল গাছের তলা হতে তাকে উদ্ধার করে প্রতিষ্টা করতে আদেশ দেন।

ভিন্ন মতে স্বর্গীয় ব্রজগোপাল মতিলাল সংগৃহীত তালিকা অনুসারে দেখা যায় যে, গুনানন্দের জয়নগরে আসার শতাধিক বছর পূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গ হতে এই স্থানে আসেন। তখনও সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা গভীর অরণ্যে পরিণত হয়নি, জয়নগর ছিল জনপদ ও সমৃদ্ধিশালী এলাকা। মতিলাল বংশের এক পূর্বপুরুষ ভবানীনাথ মতিলাল পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জেলোর কাছে জলদস্যু ও রথপথ নির্মাণ শেখেন, পড়ে রায় নগরের রাজা বিভূতিশেখর ও তৎপুত্র রঙ্গিলা রায়ের সরকারি নৌসেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবন জলপ্লাবিত হয়ে রায়নগর জলশূন্য হয়ে যায় ও বিস্তীর্ণ এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই জঙ্গলাকীর্ণ জয়নগরে এসে গুনানন্দ মতিলাল তাদের কূলদেবী জয়চন্ডীকে পুনরুদ্ধার করেন এবং এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। গুণানন্দের প্রতিষ্ঠিত মা জয়চন্ডীর মূর্তি বকুলগাছের কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত কিন্তু মায়ের আসল রূপ স্বরূপ গুণানন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন একটি প্রস্তর খন্ড বকুল গাছের তলা হতে। সেই প্রস্তর খন্ড ও কাঠ দ্বারা নির্মিত মূর্তিই বর্তমানে পূজিত হয়ে আসছেন। মায়ের মন্দির আগে মাটির তৈরী ছিল, পরে কোলকাতার সুবিখ্যাত শ্রীমান বংশীয় এক ব্যক্তি মহাশয়ের উদ্যোগে পাকা মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিন্তু মন্দিরের চাঁদনির কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি মারা যান। এর প্রায় ২৫-৩০ বছর পর স্বর্গীয় নিত্যহরি মতিলাল ও শ্যামাদাস ঘটকের অর্থানুকূল্যে চাঁদনির কাজ সম্পন্ন হয়।

ধন্বন্তরীর মতই জয়চন্ডী তলায় ও বেশের মেলা শুরু হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ধন্বন্তরী মাতার জন্মতিথি উপলক্ষে বেশের মেলা বসে একমাস ধরে, এই মেলা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় জয়চন্ডী তলার মেলা। মায়ের এই মেলা কেন্দ্রিক মাহাত্ম্যও লোকমুখে কাহিনী স্বরূপ শোনা যায় যে, জয়নগরের ব্যানার্জী মহাশয়ের পূর্বপুরুষের বাগানে একবার প্রচুর 'নটে শাক' চাষ হয়েছিল এবং মা জয়চন্ডী যেহেতু রাত্রিবেলায় বালিকা বেশে ঘুরে বেড়ান তাই তাঁর নজর পড়ে ব্যানার্জী বাড়ির বাগানের ওই নটে শাকের উপর, যথারীতি মায়ের শাক ভক্ষণের ইচ্ছে হয় এবং তিনি প্রতি রাত্রে শাক আঁচল ভর্তি করে নিয়ে যায়। সময়টা ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষ তিথি, গৃহকর্তার তীরস্কারে বাগানের মালি সেই রাত্রে পাহারায় বসেন দেখার জন্য যে শাক কে নিয়ে যায়। এমত অবস্থায় গভীর রাতের অন্ধকারে দূর থেকে মালী মা কে চোর ভেবে হৈ চৈ শুরু করেন এবং মা জয়চন্ডী দ্রুত পালাতে গিয়ে তার এক পায়ের নূপুর ফেলে আসেন। পরদিন সকালে ব্যানার্জী মহাশয় ছড়ানো শাক অনুসরন করতে করতে মায়ের মন্দিরের নিকট হাজির হন ও

দেখেন মায়ের আঁচল ভর্তি নটে শাক এবং মায়ের একটি পায়ের নূপুর সত্যিই নেই। ব্যানার্জী মহাশয় অশ্রুভরা চোখে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়েন, ভক্তের চোখে এই আনন্দ অশ্রুটুকু দেখার জন্যই বুঝি মায়ের এমন ছলনা।

বর্তমানে কয়েকশো বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু ওই দিনটি স্মরণে রেখে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে পঞ্জিকা মতে শুভদিন অনুযায়ী মায়ের ভোগের জন্য ব্যানার্জী পরিবারের বংশধরেরা প্রচুর নটে শাক পাঠিয়ে দেন এবং ওই দিনটি নটে শাকের জাত উৎসব পালিত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেবীর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে একপক্ষকাল ব্যাপী দেবীর রূপ পরিবর্তনের মহামেলা আয়োজিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বস্তুতপক্ষে সমীক্ষা অনুযায়ী জানতে পারা যায় যে, ধন্বন্তরী কালীমন্দির তথা বহু মন্দির রয়েছে যেখানে এখনও বলি প্রথা চলে আসছে। এই প্রথাটি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বহমান মানুষ দলবদ্ধভাবে শিকারে যাওয়ার পূর্বে গুহার দেওয়ালে সম্ভাব্য পশুর দৃশ্যাবলী আঁকতেন, তাদের এই মানসিকথা কারন স্বরূপ বলা যেতে পারে যাদু বিশ্বাস বা অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থাশীল ছিল। প্রাচীন গুহাচিত্রে দেখা গিয়েছে পশুর মাথা বা কলজে বল্লম বা তীরের দ্বারা বিদ্ধ করা এর অর্থ হলো কাঙ্ক্ষিত সেই পশুর ছবি এঁকে আদিম মানুষ কল্পিত কোন অলৌকিক সত্তা বা নৃবিজ্ঞানে যার নাম 'মান্যা', অথবা বিশেষ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতেন। যদি সেই প্রাণীকেই শিকার করতে পারত তবে তা সেই সত্তা বা দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করতেন তারা এবং সেই দেবতাকে তুষ্ট করার উপায় হিসেবে শিকার করা প্রাণীর দেহের ভালো অংশটা (মস্তক বা পাঁজর) নিবেদন করে ফেলে রাখতেন নৈবেদ্য রূপে। পরে কোন মাংসাশী প্রাণী ঐ উৎসর্গিত দেহ খন্ডটি ভক্ষণ করলে তারা মনে করতেন যে তাদের কল্পিত সত্তা বা দেবতা সেই নিবেদন গ্রহন করেছেন ও পরবর্তী শিকারের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেছেন।

আদিম মানসিকতা থেকে সঞ্জাত এই ধারণা একবিংশ শতাব্দীতেও আরো ঘরোয়া অভিব্যক্তি দেখা যায়- হিন্দু সমাজে বহু বাঙালি ঘরে খেতে বসে থালা ভর্তি ভাতের থেকে একটুখানি তুলে নিয়ে নারায়নের উদ্দেশ্যে "ভজনেষু জনার্দন" ইত্যাদি মন্ত্র মনে মনে বলে নিবেদন করে তারপর খাওয়া শুরু করেন। এছাড়া খ্রীস্টানদের প্রার্থনাতেও- "Oh lord give us this day our daily bread...", অর্থাৎ এখানেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একই মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও দ্বিপ্রাহরিক নামাজের অভ্যন্তরেও সেই একই আদিম প্রবণতার উত্তোরন ঘটেছে তা বলা বাহুল্য। তাই সম্প্রদায় যাই হোক না কেন সাম্প্রদায়িক বিভেদ হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি ধর্মের উৎপত্তি ঘটার অনেক আগেই কৌম্য সমাজ গড়ে উঠেছিল, সেই নিয়মেই কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে ঠিকই, তবে তার অন্তর্নিহিত অর্থ ও মানসিকতার বদল ঘটেনি।

আধুনিক সমাজে নরবলি প্রথা বা পশু হত্যা অনেকাংশে হ্রাস পেলেও সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, যে কোন শুভ কাজের শুরুতে নারকেল (এদেশে) অথবা ভর্তি মদের বোতল (বিলেতে) আছাড় মেরে ভাঙার রীতি রয়েছে। ওই নারকেল বা বোতল হল এখানে নরমুণ্ডের প্রতীক স্বরূপ। এছাড়াও মানুষ কিংবা পশুর বদলে দেবতার উদ্দেশ্যে চালকুমড়ো, আঁখ প্রভৃতি আনাজ বা ফল বলি দেওয়ার মধ্যে আরেকটি আদিম প্রবনতা প্রতিভাত হয়।

প্রসঙ্গত কাল্পনিক সত্ত্বার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত নৈবেদ্য বা প্রসাদ যাইবলী না কেন প্রাগ ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একই নিয়মে চলে আসছে, কেবলমাত্র কালের বিবর্তনে কিছু আদিম মনোভাব পাল্টেছে মাত্র। বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে, হিন্দু শাস্ত্রের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত মানুষের উদ্দেশ্যে পুকুরের বা ঘাটের পাশে একটি ভাত সরা রাখা হয় সেই সরা থেকে কোন পশু পাখি প্রদত্ত অন্নটি ভক্ষণ করলে মনে করা হয় সে মৃত মানুষের আত্মা যে কোন পশু পাখির রুপ ধারন করে সেটি গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও গ্রাম বাংলার নবান্ন উৎসবের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম দেখা যায়, "ডাকশাঁকে উড়ে এসে" কাকেরা নতুন ধানের নবান্ন গ্রহণ করলে মনে করা হয় যে দেবতা সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়েছে।

প্রায় ৪০০ বছর ধরে ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ মন্দির ধন্বন্তরী ও জয়চন্ডী তলা। বর্তমানে সাদরে পূজিত হচ্ছেন বটে, তবে বলাবাহুল্য আধুনিক সমাজে তাদের মাহাত্ম্য অনেকাংশেই হ্রাসমান। মরা মানুষ জীবিত করার কাহিনী শিক্ষিত সমাজ আড় চোখে দেখে, যে যুগে বিজ্ঞান ও technology প্রখর ও সমৃদ্ধশালী সেখানে মানুষ রোগ ভোগের জন্য ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন না হয়ে ডাক্তারের নিকট যান। কোনরকম অলৌকিক কান্ডকারখানায় আস্থাশীল নন। বাঙালির নিকট বর্তমান উৎসব মেলা বিনোদনের অংশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে নানান অনুষ্ঠান হয়, তবে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিমূলক বা ঈশ্বর কেন্দ্রিক নাম-গান, পালা, গাজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো আগে, বর্তমানে তা বহুলাংশে পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ তাঁর দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে মন পরিবর্তনের জন্য মেলা পার্বণে ভিড় জমান এবং একথা খুব সত্য যে, কজন মানুষই বা মেলার মূল উৎস যে পূজার্চনা হয় দেব-দেবী কেন্দ্রিক, তার সিকিভাগও অংশীদারী হন না।

এহোবাহ্য যে, গ্রামেগঞ্জে এখনো পূর্বপুরুষের তৈরি ঐতিহ্য রীতি ও প্রথা মেনেই দেবতাদের আরাধনা হয় এবং এখানেই উঠে আসে চিরায়ত প্রবাদ প্রবচনটি **"বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহু দূর"**। অর্থাৎ সমাজ যতই পরিবর্তিত আধুনিক মনস্ক হোক না কেন ধর্ম-কর্মের ভয় সকলেরই আছে, মানুষ যত বড়োই জ্ঞানী হয়ে উঠুক বিপদে পড়লে মনে মনে অন্তত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় এবং মজার বিষয় হল বিপদ কেটে গেলেই সে আবার পূর্বাবস্থানে ফিরে আসে। তাই এখানে বলা যেতেই পারে যে আধুনিক সমাজ-মন খাম-খেয়ালিপনার জন্য চঞ্চল ও উগ্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: দেবতা নির্ভর যে সমাজ গড়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে তার কারণ অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে ভরসা করতে হতো বিশ্বাসের উপর ও ঐশ্বরিক নামক অজাগতিক বস্তু বিশেষকে কেন্দ্র করে, তবে সকল নিয়মই যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, প্রপিতামহদের তৈরি সংস্কার একেবারেই তাচ্ছিল্ল্য যোগ্য নয়। তার পিছনেও নির্দিষ্ট কারণ ছিল, যেমন শুভ কাজে বেরোনোর আগে গুরুজনদের প্রনাম করে তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া এবং মনে বল পাওয়া যে কাজটি শুভ ও সার্থক হবে। এছাড়া বিড়াল রাস্তা কাটলে সেই পথে না যাওয়া বা ক্ষণিক অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা করা, এর অর্থ হল পশুরা মানুষের মতো বিচক্ষণ নয় তাদের রাস্তা পারাপারের সময় সতর্কতা অবলম্বনের জ্ঞান নেই। দলবদ্ধ যদি পশুর দল হয় তাদের একজন রাস্তা পার হয়ে দেখে এবং পরপর সবাই রাস্তা পারাপার হয়, তাই গাড়ি না থামালে একটা দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে, সেই কারণে এমন নিয়ম করা, এছাড়াও আরো অজস্র সংস্কার আছে যার ভিত্তি বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে **ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন- "আমি যা বিশ্বাস করি তাই belief আর আমি যা বিশ্বাস করি না তাই superstition বা সংস্কার"।** সংস্কারের ক্ষেত্রে কুফল ও সুফল দুটো দিকই

আছে। একজন individual মানুষ যখন একটি সংস্কারের বশবর্তী হয়ে চলে তখন তাঁর কাছে ওই সংস্কারটি superstition বা কু-সংস্কার যার বিজ্ঞানসম্মত কোন যুক্তি নেই। তবে সমাজ যদি সেই একই সংস্কারকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বা মেনে চলে তবে সেই সংস্কারের ভিত্তি আছে যুক্তিও আছে, ঠিক যেভাবে 'আমি'র চেয়ে 'আমরা' এর গুরুত্ব বেশি। সংস্কার এককভাবে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু লোক সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী এবং সামাজিকভাবে তার মূল্যও অনস্বীকার্য। **ড. সুভাষ মিস্ত্রীর মতে- "একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা ঐতিহাসিক পরিবেশ পরিমণ্ডলে একই আচার-আচরন ও জীবনচর্চায় অভ্যস্ত সংহত একটি জনসমষ্টি যে বিশেষ আচার আচরন এবং ক্রিয়াদিকে শুভাশুভ বোধ জড়িত করে কর্তব্য বা অকর্তব্য বিবেচনা করে তাই Folk-belief বা লোক বিশ্বাস।"**

বিবর্তনের সাথে অস্তিত্ব বজায় রাখাই সমাজের নীতি না হলে জগৎ চলা ভার। বর্তমান সমাজে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে পাল্টেছে মানুষের রুচি, ধারনা ইত্যাদি। তাই পুরাকালের কিংবদন্তি দেব-দেবী (**ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা** প্রভৃতি) অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সম্মত দেবতা এবং লৌকিক দেবী (**দক্ষিণরায়, বনবিবি, নারায়নী, আটেশ্বর** প্রভৃতি) অশাস্ত্রীয় দেবতা উভয়ই মানুষের মননের সাথে নিজেদের মাহাত্ম্যের রূপান্তর ঘটিয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

ধন্বন্তরী কালী বা জয়চন্ডী দেবীর পুরাকালের মাহাত্ম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে এখন শুধুমাত্র বাতের ব্যথা বা রোগ-শোক মুক্তির উপায় কে উহ্য রেখে, সন্তানহীনা মায়েরা সন্তান কামনার জন্যে, পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য কিংবা চাকরি প্রার্থীদের মানসিক কামনার্থে বর্তমানে এরা পূজিত হয়ে আসছেন। আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর রূপান্তরের প্রেক্ষিতে গোত্রান্তর ঘটেছে। পূর্বপুরুষের সময়কাল থেকে চলে আসা সংস্কার, পূজা-পাঠ, উপাদান সমূহের মধ্যে নিহিত ভাবব্যাঞ্জনাগুলির মৌল তাৎপর্য বহুক্ষেত্রে হারিয়ে ফেললেও মূল কাঠামো আজও অপরিবর্তিত, কালের বিবর্তন বহিরঙ্গিক মাত্র, সেই বেঁচে থাকার তাগিদ ও পার্থিব চাহিদা আজও একই ভাবে প্রবল।

তথ্যঋন:

1) চক্রবর্তী শ্রী অলোক, পূজারী ধন্বন্তরী কালী মন্দির, জয়নগর মজিল্পুর
2) সরকেল প্রশান্ত, প্রাক্তন পৌরপিতা, জয়নগর মজিল্পুর
3) হালদার সুকুমার, পৌরপিতা, জয়নগর মজিল্পুর পৌরসভা
4) হালদার গোবিন্দ, এলাকাবাসী, জয়নগর মজিল্পুর
5) রায় তপন, এলাকাবাসী, জয়নগর মজিল্পুর

গ্রন্থঋন:

1) সেনগুপ্ত পল্লব, 'পূজা পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯
2) মিস্ত্রী সুভাষ, 'লোকায়ত সুন্দরবন- ৪',
দিয়া পাবলিকেশন, ৮৮/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯
3) মিস্ত্রী সুভাষ, 'দক্ষিণবঙ্গের লোক সমাজে মন্ত্র', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯
4) বিশ্বাস সুশান্ত, 'লুপ্ত প্রায় লোকসংস্কৃতি', লোকগ্রাম, ছিট কালিকাপুর, কলকাতা- ৯৯
5) বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, 'বাংলার লৌকিক দেবতা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩
6) ঘোষ সঞ্জয়, 'সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা (একটি সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণ)', প্যারালাল প্রেস, ২৮/৩/সি ঊর্মিলা কমপ্লেক্স (দ্বিতল), ঠাকুরপাড়া রোড, জয়নগর মজিল্পুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৭।